সেই সিংহ আবার জেগে উঠবে

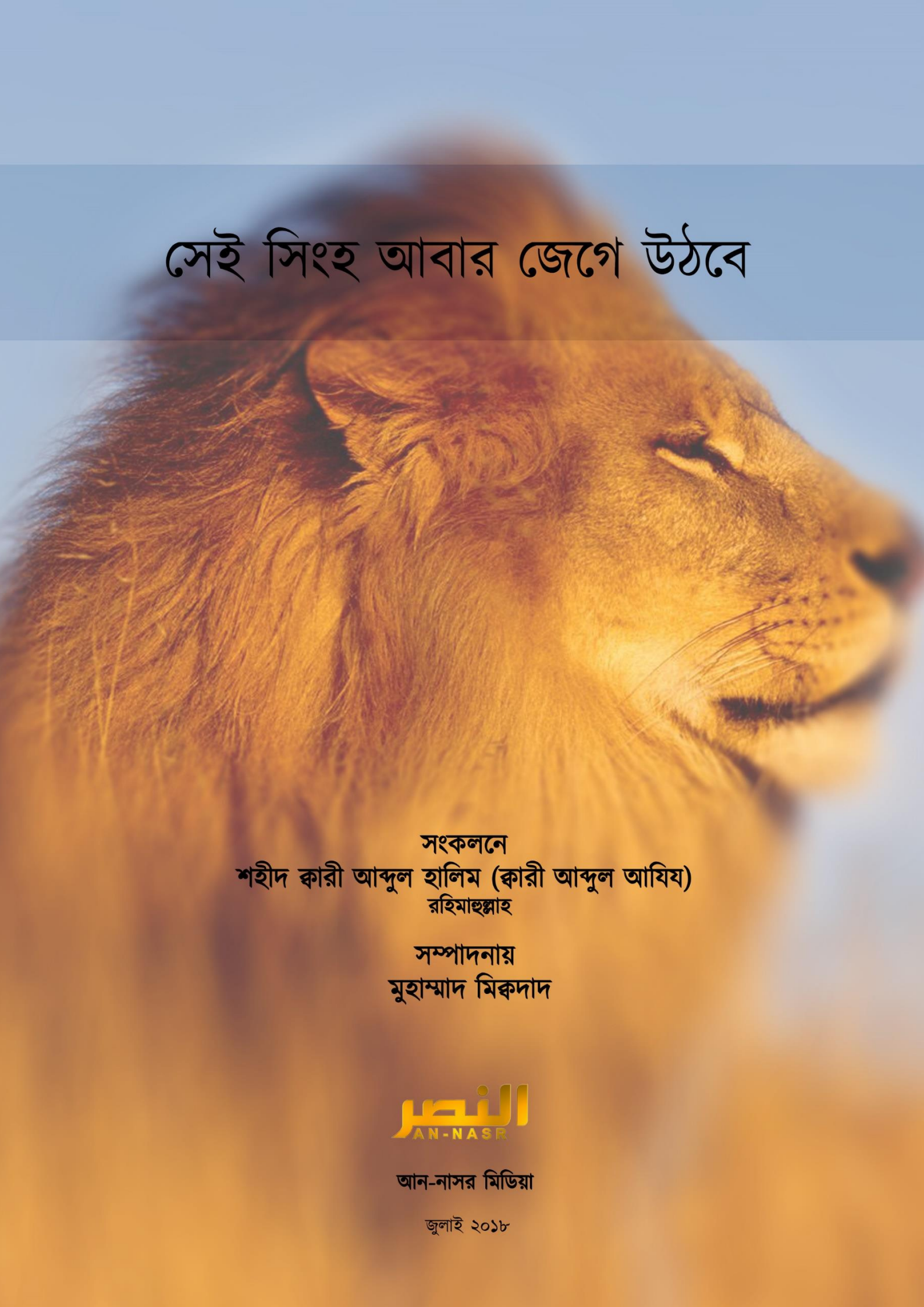

সংকলনে
শহীদ ক্বারী আব্দুল হালিম (ক্বারী আব্দুল আযিয)
রহিমাহুল্লাহ

সম্পাদনায়
মুহাম্মাদ মিক্বদাদ

আন-নাসর মিডিয়া

জুলাই ২০১৮

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি। এই প্রবন্ধটি উর্দু প্রবন্ধ "*وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا*" এর অনুবাদ। মূল প্রবন্ধটি ২০১২ সালে উর্দু ম্যাগাজিন "হিত্তীন" সংখ্যা-৮ এ প্রকাশিত হয়; ছয় বছরের পুরনো হলেও, প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু আজও আলোচনার দাবি রাখে।

মানবজাতির মুক্তি নিহিত আছে ইসলামে, আর ইসলাম মানবজাতির জন্য যে শাসনব্যবস্থার শিক্ষা দেয় তা হল খিলাফত শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থা দাপটের সাথে পুরো বিশ্বকে প্রায় এক হাজার বছর শাসন করেছে। পারস্য সাম্রাজ্যকে বিলুপ্ত করে এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক বিজয় করে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর শাসনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল মুসলিম খলিফাগণ। দুনিয়ার বুক থেকে এই শাসনব্যবস্থাকে কাফেররা শেষ করে দিলেও, মুসলমানদের মাঝ থেকে জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত এই চেতনা তারা মুছে ফেলতে পারেনি। যার ফলস্বরূপ, খিলাফতের পতনের পর থেকেই উম্মতের ভেতরে শুরু হয়ে যায় নবুয়্যতী (ﷺ) পদ্ধতিতে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। পুরো উম্মতের প্রতিরক্ষার এই আন্দোলনের এক মাইলস্টোন হল "আল-কায়েদা" এর প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে উম্মতের প্রতিরক্ষার জন্য যে বৈশ্বিক জিহাদ অব্যাহত আছে, তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এই সংগঠনের নেতৃত্বের হাতে। এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু মূলতঃ আল-কায়েদা ও বৈশ্বিক জিহাদের ইতিহাস এবং বৈশ্বিক জিহাদ কিভাবে আবারও কাঙ্ক্ষিত সেই খিলাফত শাসনব্যবস্থা দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তার আলোচনা। বৈশ্বিক জিহাদকে বোঝার জন্য এই প্রবন্ধটি তাই যথেষ্ট উপকারী।

অনুবাদক শহীদ ক্বারী আব্দুল হালিম (রহঃ) এর এই অনুবাদকে আল্লাহ তাঁর রাস্তায় কবুল করুন এবং বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য বৈশ্বিক জিহাদকে অনুধাবন করার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

সম্পাদক

মুহাম্মাদ মিক্বদাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

সেই সিংহ আবার জেগে উঠবে!!!

১) স্বাভাবিক কিন্তু উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় সাক্ষাৎ

এ ঘটনাটি ঘটে ১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে। সৌদি আরবের একজন উচ্চবংশীয় যুবক শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য জর্ডানে পৌঁছেন। শায়খ আযযাম (রহঃ) কয়েক দিন আগেই আফগান রণাঙ্গন হতে জর্ডানে পৌঁছেছিলেন এবং আরব যুবকদেরকে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করানোর জন্য ও মুজাহিদদের জন্য অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। আত্মসংযমী এই ইয়েমেনী যুবক শায়খ আযযাম (রহঃ) এর কাছে আফগান জিহাদ সম্পর্কে প্রায় চার ঘন্টা পর্যন্ত মতামত বিনিময় ও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শায়খ আয্যাম (রহঃ) ও স্বীয় পিতৃসুলভ স্নেহ এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীলতার সাথে তার এক একটি উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর দেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম উম্মাহর ব্যথায় ব্যথীত জীবন মরণ উৎসর্গকারীর একটি দরদী মন অন্য একটি দরদী মনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলো। কে জানত যে, দু'জনের মধ্যে শুধুমাত্র চার ঘন্টার এ আলোচনা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী চূড়ান্ত মোড় (Turning point) হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের এ কল্যাণকর সাক্ষাৎকার কুফ্ফারদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী কুফরি শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ উচ্ছেদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিগণিত হবে।

যুবক উসামা বিন লাদেন (রহঃ) সেই মিলনায়তনে বসে বসেই ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুচ্ছ ভোগবিলাসকে প্রত্যাখান এবং জিহাদের ময়দানে ধাবিত হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঐ বছর শেষ হওয়ার আগেই নিজ কাজকর্ম গুটিয়ে আফগানিস্তান পৌঁছেন। তিনি রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো শক্তি ও বল নিয়ে রুখে দাঁড়ানো আফগান জাতির হতাশা ও দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে যুবক উসামা বিন লাদেন (রহঃ) অত্যন্ত বিষণ্ণ ও মর্মাহত হন এবং মুসলিম উম্মাহর পক্ষ হতে জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি উপেক্ষা ও অমনোযোগীতাদেখে করে তিনি আরো মর্মাহত হয়ে পড়েন। আফগান জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তার মর্মবেদনা এভাবে বর্ণনা করেনঃ

"আমি নিজেই আফগান জিহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি যে, মুজাহিদদের কাছে লোকসংখ্যা ও পার্থিব উপাদান এ দু'টিরই অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তাদের কাছে যুদ্ধ পরিচালনা করার মতো মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নেই। এ অনুভূতি আমাকে জর্জরিত করে তুলে যে, আমরা নিপীড়িত মযলুম আফগান ভাইদের পাওনা যথাসময়ে আদায় করতে পারিনি এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগীতার ব্যাপারে আমরা আমাদের কর্তব্য পালনে অত্যন্ত বিলম্ব করেছি। আমি অবগত হতে পেরেছি যে, এ অপরাধের যথোপযুক্ত খেসারত দিতে হবে আর যথোপযুক্ত খেসারত এটাই যে, একজন মুসলিম হিসেবে তাদের সাথে এক হয়ে কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও ক্বিতালের মাধ্যমে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা (অর্থাৎ শাহাদত

এর উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হওয়া); হতে পারে এভাবে ফরযে আইন পালনে যে বিলম্ব হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ সাধিত হবে"।

এটা ছিল তার সেই পবিত্র অনুপ্রেরণা যা অন্তরের অন্তঃস্থলে গেঁথে শায়খ উসামা বিন মুহাম্মদ বিন আওদ বিন লাদেন (রহঃ) সর্বপ্রথম জিহাদের ময়দানে অবতরণ করেছিলেন। শায়খ উসামা (রহঃ) এর অভীষ্ট লক্ষ্য কোন ধরনের খ্যাতি বা সম্মান অর্জন ছিল না, আর না ছিল কোনো পার্থিব জগতের অর্থ-সম্পদ এর অর্জন। তিনি একমাত্র আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশা নিয়ে "ফরযে আইন" আদায় করার জন্য আল্লাহর পথে স্বীয় জীবনকে বিলীন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বের হয়েছিলেন (نحسبه كذلك والله حسيبه)। কিন্তু, আল্লাহর অনুমোদন ও ইচ্ছা এটাই ছিল যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে থাকার সময় শাহাদাতের এই উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হওয়ার পরিবর্তে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনাকালে তা অর্জিত হয়েছে। তার শাহাদাত ১৯৮৪ সালে আফগানিস্তানে সংগঠিত হয়নি বরং ঠিক তার সাতাইশ বছর পর ২০১১ সালের গ্রীস্মকালে পাকিস্তানে হয়েছে। তার শাহাদাতের ঘটনা এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছে, যখন তিনি তৎকালিন তথাকথিত "সুপার পাওয়ার" এর পরাজয়ে অংশ নেওয়ার পর এবং বর্তমানে তথাকথিত "সুপার পাওয়ার" কে পর্যুদস্ত করার ভিত্তি ও বুনিয়াদ স্থাপন করার পর সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার শাহাদাতকে কবুল করে তাকে আম্বিয়া (আ), সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালেহীনদের সাহচর্য দান করুন আমিন!

২) "মাসিদাতুল আনসার" নামক ট্রেনিংক্যাম্প এর প্রতিষ্ঠা

জিহাদের ময়দানে কিছু দিন অতিবাহিত করার পর বিশ্বের চতুর্দিক হতে আগমনকারী মুহাজির মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৮৬ সালে আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের "জাজী" নামক এলাকায় শায়খ উসামা (রহঃ) **"মাসিদাতুল আনসার"** নামে প্রশিক্ষণ শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবিরের বড় উদ্দেশ্য ছিল মুজাহিদদের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রভাব ও নির্ভরতা থেকে মুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। এ প্রশিক্ষণ শিবিরটি আরব যুবকদের মাঝে জিহাদের প্রেরণা যোগাতে সহায়ক হয় এবং আগামী দিনের এমন একটি প্রজন্মের উত্থানের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় যা (حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ) অর্থাৎ "দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুর ভয়" এর মতো বিপজ্জনক ঝুঁকি ও জাতীয়তাবাদীতার কলঙ্ক হতে মুক্তি দেয় এবং মুসলিম উম্মাহর গৌরবময় অতীতকে ফিরিয়ে আনে। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কমান্ডোরা এই ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলা করে। কিন্তু, মুজাহিদদের দাঁতভাঙা জওয়াবে তারা পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তাগুতের প্রভাব থেকে মুক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রতিরক্ষার এই যুদ্ধক্ষেত্রে শায়খ আযযাম (রহঃ) ও শায়খ উসামা (রহঃ) সশরীরে অংশ নিয়েছিলেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে শায়খ উসামা (রহঃ) এর বীরত্ব পরবর্তীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং মুজাহিদদের জন্য এই যুদ্ধ এক কৌশলগত বিজয় হিসেবে প্রমাণিত হয়।

৩) মুজাহিদদের হাতে সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্তমূলক পরাজয়

শুধুমাত্র কয়েক বছর পর ১৯৮৯ সালে বিশ্ববাসী বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পায়। আর তা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন এর বিশাল পরাজয়ের দৃশ্য যা আবার অস্ত্র-বস্ত্রহীন আফগান ও পৃথিবীর আনাচে কানাচে হতে আগত সম্বলহীন মুহাজির মুজাহিদদের হাতে। এটা এতো বিশাল ব্যাপার ছিল যা কল্পনাও করা যেতো না। অথচ রাশিয়ার দাপট সমস্ত বিশ্ব জুড়ে খ্যাত ছিল যার বিরুদ্ধে ন্যাটো বাহিনী লড়াই করারও সাহস করতো না, যুক্তরাষ্ট্রও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই বা শীতল যুদ্ধ (cold-war) কে উত্তপ্ত যুদ্ধে (hot-war) পরিবর্তন করতে সাহস পেতো না; সেই বিশাল রাশিয়ার দাপটকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় নিঃসম্বল মুজাহিদ বান্দাদের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা রাশিয়াকে এমনভাবে পরাজিত করেন যার কারণে তাকে তার বিজিত মুসলিম দেশগুলো হতে বহিস্কৃত হতে বাধ্য হতে হয়। এর ফলে পরাধীন মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে।

৪) মুজাহিদদের ওপর রাশিয়ার পরাজয়ের প্রভাব

এই আশ্চর্যজনক বিজয় জিহাদি কাফেলার সৈনিকদের এবং বিশেষ করে শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর স্মৃতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যা শায়খ উসামা (রহঃ) স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করেনঃ

"সোভিয়েত রাশিয়ার পরাজয় মুজাহিদদের জন্য এক অভিনব অভিজ্ঞতা হিসেবে পরিগণিত হলো। এই ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের সম্মুখে চিন্তার নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত করলো। আমাদের চিন্তার আকাশে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা প্রশস্ত করে তুললো এবং আমাদের ঈমান ও ইয়াকীনকে আরো দৃঢ় করে তুললো যে, আপাতদৃষ্টিতে কাফের রাষ্ট্রসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী মনে হলেও তা ছিল সত্যিকার অর্থে খুবই স্থিতিহীন। যদি আমরা আল্লাহর প্রতি অটল আস্থা রেখে তারই সাহায্যে, শরীয়তের আহকাম অনুযায়ী তথাকথিত বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি তাহলে ইনশাআল্লাহ তাদেরকে অনায়াসে সমূলে উৎখাত করতে সক্ষম হবো। আর আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব ও অসাধ্য মনে হয় তা সম্ভবে পরিণত হবে। সোভিয়েত রাশিয়ার পরাজয় এবং মুসলিম উম্মাহর সমষ্টিগত অবস্থা সর্ম্পকে শান্ত মনে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ দেয় আমাদেরকে। অতঃপর আমরা চিন্তা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকি যে, কি করে আমরা আমাদের প্রিয় উম্মাহকে পরাশক্তিদের নির্যাতন, জুলুম ও নিপিড়ন হতে রক্ষা করতে পারবো। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ এর এ দক্ষতা আমাদের জন্য সমস্ত মুসলিম বিশ্বে বিপ্লব সাধিত করার ক্ষেত্রে চাবি হিসেবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে।"

৫) আল-কায়েদার আবির্ভাব

সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান হতে যাওয়ার আগেই "আল-কায়েদা" নামটি প্রকাশ পায় এবং শায়খ উসামা (রহঃ) এর সহচর মুজাহিদদেরকে "আল-কায়েদা" নামে অভিহিত করা হয়। শায়খ উসামা (রহঃ) আল-জাযিরা টিভির প্রতিনিধি "তায়সীর উলওয়ানী" এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে এই নামের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করেনঃ

"আমাদের এক সম্মানীত সাথী শায়খ আবু উবাদাহ (রহঃ) আফগানিস্তানে স্বৈরাচারী সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদরত যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির কায়েম করেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরকে আমরা "আল-কায়েদা" (মারকাজ) বলে অভিহিত করতাম। এটাকে আমরা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মনে করতাম। অতঃপর এই নামটি ধীরে ধীরে প্রসিদ্ধ হতে লাগলো। কিন্তু এ নামটি শুধুমাত্র জিহাদের কাজকে সংগঠিত করার জন্য ব্যবহার হতো "আল-কায়েদা" মুসলিম উম্মাহ হতে স্বতন্ত্র ও পৃথক কোনো অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য রাখে না। আমরা মুসলিম উম্মাহর অপরিহার্য অংশ যা উম্মত হতে বিভক্ত করা কখনো সম্ভব নয়। আমরা এ উম্মতেরই সন্তান ও রক্ষক।"

৬) আরব উপদ্বীপে আমেরিকান ক্রুসেড সেনাবাহিনীর প্রবেশ

সোভিয়েত রাশিয়ার পরাজয়ের পর শায়খ উসামা (রহঃ) ও তার সাথীরা স্বীয় ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। কিভাবে নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পেষিত মুসলিম উম্মাহকে কাফের ও তাদের দালাল শাসক গোষ্ঠীর দাসত্ব হতে পরিত্রাণ দেওয়া যায়। আগামী দিনের জন্য এ ব্যাপারে যখন তিনি স্বীয় সাথীদের সাথে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্পর্কে পরামর্শ করছিলেন তখন বিশ্বের কাফেররাও স্বীয় কৌশল গ্রহণে তৎপর ছিল। একদিকে ক্রুসেড-জায়নবাদী ঐক্যজোট ১৯৯০-১৯৯১ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে ইরাকের উপর আক্রমণ করে, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সর্বশেষ অসীয়ত বাণীকে উপেক্ষা করে সৌদি আরবের আত্মসাৎকারী রাজ পরিবার আমেরিকান সেনাবাহিনীকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করার এবং সেখানে সেনানিবাস নির্মাণ করার অনুমতি দেয়। শায়খ উসামা (রহঃ) এ ব্যাপারে সৌদি সরকারের প্রতি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করেন। সৌদি সরকার খুব শীঘ্রই বুঝতে পারল যে, শায়খ উসামা (রহঃ) সাময়িকভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য জিহাদে অবতরণ করেননি বরং সে জিহাদকে জীবনের স্থায়ী পথ ও নবী (ﷺ) এর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে সৌদি সরকারের পক্ষ হতে তার কর্মতৎপরতার প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপিত হতে লাগলো। শায়খ উসামা (রহঃ) সরকারের পক্ষ হতে বাধা-বিঘ্ন অবলোকন করে দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ১৯৯১ সালে তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাথী নিয়ে সুদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পরবর্তী কয়েক বছর তিনি সুদানকেই স্বীয় কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিলেন।

৭) ইহুদী ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি এবং আমেরিকার সাথে সরাসরি লড়াই

আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতারা বিশ্ব পরিস্থিতির উপর চিন্তা গবেষনা এবং উলামায়ে কিরামদের নিকট হতে উপদেশ গ্রহণ করার পর এই সিদ্ধান্তে অবিচল হয়েছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়াকে দমন করার পর অদ্যবধি ফিলিস্তিনের ওপর দখলদার ইহুদীদের ক্ষমতা এবং তাদের ধারক-বাহক ও সাহায্যকারী আমেরিকানদের শক্তিকে ধ্বংস করা মুজাহিদদের লক্ষ্যবস্তু হওয়া প্রয়োজন। শায়খ উসামা (রহঃ) এ চিন্তাধারাকে বর্ণনা করে লিখেনঃ

“মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার পর আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছিলাম তা সংক্ষেপে দু’টি দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করা যেতে পারে। তার একটি হলো এই যে, মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবর্ণনীয় ঘোলাটে পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি এবং ফিলিস্তিন হতে ইহুদী আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটানো ঐ সময় পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব হতে আমেরিকার কর্তৃত্বের অবসান না হয়। কেননা মুসলিম বিশ্ব আজ পরাধীনতার কবলে নিমজ্জিত, তারা আজ আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার গণ্ডিতে ভীষণভাবে জড়িত এবং এ বিশ্ব ব্যবস্থার নেতৃত্ব, আমেরিকা, ইহুদীদের সব চাইতে বড় সমর্থক। দ্বিতীয়ত যেহেতু আমেরিকা সোভিয়েত রাশিয়া হতে ভিন্ন ধরনের শত্রু, তাই তাকে যুদ্ধে গতানুগতিকভাবে প্রচলিত নিয়মে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তার বিরুদ্ধে অপ্রতিসম (Asymmetric) পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে হবে”।

অতঃপর, উপরোক্ত এ লক্ষ্যবস্তুকে সম্মুখে রেখে শায়খ উসামা (রহঃ) আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য সাথীদেরকে উৎসাহিত করতে এবং সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমেরিকার সাথে জিহাদে লিপ্ত হওয়ার প্রথম সুযোগ সোমালিয়াতে আমেরিকান আগ্রাসনের প্রাক্কালে দেন। শায়খ উসামা (রহঃ) এর গেরিলা মুজাহিদেরা সোমালিয়াতে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের লড়াইতে প্রায় দুইশত আমেরিকান সেনাকে হত্যা ও দু’টি হেলিকপ্টার ধ্বংস করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা সোমালিয়া হতে পালাতে বাধ্য হয়।

৮) আল-কায়েদা এবং তালেবান এর মাঝে শাশ্বত ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সূচনা

১৯৯৫ সালের শেষের দিকে সুদান সরকার আমেরিকা ও সৌদি সরকারের চাপে তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং শায়খ উসামা (রহঃ) ও তার সাথীদেরকে সুদান ত্যাগ করার আহবান জানায়। শায়খ উসামা (রহঃ) তার নিকটতম সাথীদেরকে নিয়ে অত্যন্ত গোপনে একটি বিশেষ বিমান যোগে আফগানিস্তানের জালালাবাদ এয়ারপোর্টে পৌঁছেন যেখানে মৌলভী ইউনুস খালেস (রহঃ) এবং মৌলভী জালাল উদ্দীন হাক্কানী (রহঃ) তাদেরকে স্বাগত জানান। এটা ছিল তালেবান আন্দোলনের প্রথম দিকে। তালেবান তখনও কাবুল দখল করেনি। ১৯৯৬ সালে কাবুল বিজয় হওয়ার পর কান্দাহার শহরে আমিরুল মু’মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর (হাফিযাহুল্লাহ) এবং শায়খ উসামা (রহঃ) এর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর, সেখানে দু’জন বিশ্ব বরেণ্য জিহাদি নেতার মাঝে দু’টি বরকতপূর্ণ সংগঠনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঈমানী বন্ধন

কায়েম হয়, যা আজ পর্যন্ত বিশ্বের কুফ্ফারদের জন্য অতিশয় কষ্টের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিণত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর যাবত যেখানে শায়খ উসামা (রহঃ) ও তার সাথীরা উত্তর প্রদেশীয় ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেন এবং আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ কাজে ইসলামী ইমারাতকে ওতপ্রোতভাবে সহযোগীতা করেন। সেখানে আল-কায়েদা মুজাহিদেরা জায়নবাদী-ক্রুসেড ঐক্যজোটের নেতা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসলামী ইমারাতের তালেবানদের সর্বাত্মক সহযোগীতা করেন।

৯) আমেরিকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে জিহাদের যথার্থতা ঘোষণা

১৯৯৬ সালে শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) সৌদি আরব তথা হারামাইনে আমেরিকান সেনাবাহিনীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা প্রচার করেন। এটা আল-কায়েদার পক্ষ হতে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল। শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এই ঘোষনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

“আল্লাহর অশেষ রহমতে খোরাসানের মত একটি নিরাপদ স্থান আমরা পেয়েছি। আফগানিস্তানের এই পাহাড়ী উপত্যকার সাথে সংঘর্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তির অধিকারী সোভিয়েত রাশিয়া ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে। আজ আমরা আফগানিস্তানের সেই আকাশ ছোঁয়া পর্বতের চূড়ায় বসে বিশ্ব ক্রুসেড-জায়নবাদী ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা করেছি, যেন এই জঘন্যতম ঐক্য আর বেশীদিন মুসলিম উম্মাহর ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করতে না পারে এবং মসজিদে আকসাহ ও মসজিদে হারামের পবিত্র ভূমিকে তাদের অপবিত্র হাত হতে উদ্ধার করা যেতে পারে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি আমাদেরকে এই মহৎ উদ্দেশ্যে সফলতা দান করুন। নিশ্চয় জয় ও পরাজয় তাঁরই হাতে সন্নিবেশিত রয়েছে এবং তাঁর ক্ষমতার সামনে কেউ টিকে থাকতে পারেনা”।

আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের এ ঘোষণা শুধুমাত্র বাক্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং অচিরেই তার বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের সূচনাও করা হয়। অতঃপর ১৯৯৬ সালেই সৌদি আরবের খোবার (Khobar) নামক স্থানে আমেরিকান বিমান বাহিনীর একটি ঘাটিতে শহীদী হামলা করা হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনীর ১৯ জন সদস্য নিহত, প্রায় চারশতের মতো আহত এবং ঘাটিটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

১০) ইহুদী ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ইসলামী সংস্থার প্রতিষ্ঠা

সামরিক অভিযানের সাথে সাথে দাওয়াত ও রাজনৈতিক ময়দানেও শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) চেষ্টা করছিলেন এবং ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে কিতালের উদ্দেশ্যে মুসলিম উম্মাহকে সমবেত করতে দিবারাত্রী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ প্রচেষ্টার ফলাফল ১৯৯৮ সালে দৃশ্যমান হয়ে উঠে যখন আল-কায়েদা, মিসরের জামা’আতুল জিহাদ, মিসরের জামা’আতুল ইসলামী এবং পাকিস্তানের কতিপয় প্রসিদ্ধ জিহাদি ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে ইহুদী ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে “বিশ্ব ইসলামী

জিহাদি সংস্থা" প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করলেন। এ ঘোষণাপত্রে সাক্ষর করেছিলেন শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ), শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ) এবং শায়খ রেফায়ী ত্বাহা প্রমুখ।

এ ঘোষণাপত্রের একটি বিশেষ দিক এই ছিল যে, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ শুধুমাত্র আরব উপদ্বীপ পর্যন্ত সীমবদ্ধ না রেখে সারা দুনিয়া ব্যাপী এ জিহাদকে প্রসারিত করা এবং সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে এ কথার প্রতি উৎসাহিত করা যে, দুনিয়ার আনাচে কানাচে যেখানেই আমেরিকার স্বার্থ নস্যাৎ করার সুযোগ পাবে সেখানেই তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে যেন ইহুদীরাষ্ট্র অর্থাৎ ইসরাইল এবং মুসলিম উম্মাহর ওপর চেপে বসা আত্মসাৎকারী ও যালেম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যায়।

এ ঘোষণাপত্রের কিছু দিন পর নিছক আল্লাহর কৃপায় সৌদি আরবের বাহিরে উপস্থিত দু'টি স্থানে আমেরিকার স্বার্থের প্রতি আঘাত করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম আঘাত উত্তর আফ্রিকার দেশ কেনিয়া ও তানজানিয়ায় উপস্থিত আমেরিকার দূতাবাসে দু'টি শক্তিশালী শহীদী হামলা করা হয় যাতে দু'টি বিল্ডিং ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এবং শত্রুদের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। দ্বিতীয় আঘাতে মুজাহিদদের গেরিলা যুদ্ধের পরিধি জলপথ পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে ইয়েমেনের সমুদ্রতীরে টহলদারি আমেরিকান নৌবাহিনীর সামুদ্রিক জাহাজ (U.S.S.COLE) এর ওপর ছোট্ট নৌকার মাধ্যমে সফলতার সাথে শহীদী হামলা করা হয়, তাতেও তাদের সামুদ্রিক জাহাজ অকেজো হয়ে পড়ে এবং দশজনের মত আমেরিকান সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

১১) ৯/১১ অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিক শহীদী হামলা

মুজাহিদদের অহরহ আঘাত সহ্য করার পরও আমেরিকার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসেনি এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সে তার অহংকারসূলভ এবং স্বেচ্ছাচারপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ঘটায়নি। একদিকে ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিমদের নিকট হতে জীবনকাল অতিবাহিত করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং অপরদিকে ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তাদের জীবন ধারণের ক্ষমতা দুঃসাধ্য করে তুলেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে ঔষধপত্র ও প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাবে পাঁচ লক্ষ ইরাকী শিশুরা জীবন হারাতে বাধ্য হয়েছে। এমনিভাবে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের জীবনধারণ দুষ্কর করে তুলে এবং এরই সাথে নবউদিত ইসলামী ইমারাতের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযান শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অতঃপর প্রথমতঃ শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এই যুদ্ধকে আমেরিকার অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন যেন জালিম আমেরিকার অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায় এবং তার প্রতারণামূলক প্রভূত্বের প্রভাবকে ধূলিসাৎ করা যায়। শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর দৃষ্টিতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা এটাও ছিল যে, কোনো রকমে আমেরিকান সেনাবাহিনীকে কোন মুসলিম দেশে টেনে এনে তাকে দীর্ঘকালীন সংঘর্ষে

লিপ্ত করে তার প্রতাপ-শক্তিকে নস্যাৎ করা[1]। অতএব, এ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে উনিশ জন শহীদী নবীনরা আমেরিকার ভেতরের এয়ারপোর্ট হতে চারটি বেসামরিক বিমান ছিনতাই করেন এবং তা নিয়ে তাদের বিশ্ব বাণিজ্য ভবনে (WORLD TRADE CENTRE) এবং আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিবালয় ভবনে (PENTAGON) সজোরে আঘাত করে তা বিধ্বস্ত করেন। এই ঐতিহাসিক আক্রমণের ফলে শুধুমাত্র আমেরিকার অর্থনৈতিক অবনতিই ঘটেনি বরং বিশ্বের মুসলমানদের মন-মানসিকতা হতে আমেরিকার প্রভাবশক্তির কল্পকাহিনীও চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা হয়।

১২) আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকান আগ্রাসনঃ আমেরিকার ঐতিহাসিক চরম ভুল

যেহেতু আমেরিকা ১১ সেপ্টেম্বরের আগেই আফগানিস্তানে হামলা করার জন্য পায়তারা চালাচ্ছিলো। অতঃপর সে ৯/১১ এর ঐতিহাসিক হামলার পর আর সহ্য করতে পারলো না এবং সেই চরম ভুল করে ফেললো যে সম্পর্কে শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) প্রথমেই অনুমান করেছিলেন। আমেরিকা স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় মাতাল হয়ে প্রথমে আফগানিস্তানে হামলা করলো এবং কিছু দিন পর ইরাকে হামলা করে বসলো। তার সামরিক মূলনীতি ছিল আংশিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করা কিন্তু সে তার এই মূলনীতিকে উপেক্ষা করে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে স্বীয় মৌলিক সামরিক নীতি হতেও বিচ্যুত হয়ে গেলো। সে তার যুদ্ধনীতি অনুযায়ী সর্বদাই চেষ্টা করতো যে, কোন সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করা ছাড়াই যতদুর সম্ভব স্বীয় প্রতিপক্ষকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, কূটনৈতিক কৌশল এবং সামরিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির মাধ্যমে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তার ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। অতঃপর যদি সত্যিকার অর্থে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেই হয় তাহলে শুধুমাত্র বিমান হামলার মাধ্যমেই তা অর্জন করা। কেননা, আমেরিকান সেনাবাহিনীর সিপাহিরা ময়দানে অবতরণ করে মুখোমুখি লড়াই হতে সর্বদাই পিছনে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু ৯/১১ এর ঐতিহাসিক অভিযান আমেরিকার অহংকারসূলভ মুখমন্ডলে চপেটাঘাত করেছে, তাই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য সে নিজের ইতিহাসে চরম ভুল করে বসে। আমেরিকা ইরাক ও আফগানিস্তানে সৈন্যসামন্ত নিয়ে অবতরণ করে এবং কয়েক বছর অতিবাহিত না হতেই ইরাকী ও আফগানী মুজাহিদদের হাতে পিটুনিতে নাস্তানাবুদ হয়; এর সাথে সাথে তাদের অহংকারও পদদলিত হয়। আজ আমেরিকা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তে অনুতপ্ত, কিন্তু পৃথিবীর একচ্ছত্র

[1]১৯৯০ সালের শেষের দিকে শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) আরব সাংবাদিক আব্দুল বারী উলওয়ান এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে. আমেরিকা যেহেতু সাত সমদ্রের তীরে অবস্থতি, তাই সেখানে গিয়ে আক্রমণ করা সহজ ব্যাপার নয়। তার শক্তিকে নস্যাৎ করার জন্য তাকে কোন মুসলিম ভূখন্ডে অবতরণ করানো আবশ্যক। এভাবে তাকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে এবং তার অর্থনৈতিক অবনতির অবসান ঘটিয়ে তার শক্তির পতন সম্ভব।

সুপার পাওয়ার এর জন্য নিজ সম্মান উচ্চ রাখার প্রশ্নে যুদ্ধক্ষেত্র হতে অতিসত্তর ফেরত যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না।

১৩) জিহাদের পরিধিকে প্রসারিত করা এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় জিহাদকে যৌথভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ

৯/১১ এর ঐতিহাসিক অভিযানের তিন বছর পর মুজাহিদদের কাতারে উপস্থিত একজন দক্ষ পরিকল্পনা গ্রহণকারী ব্যক্তি শায়খ আবু বকর নাজী এর লিখিত "অরাজকতার ব্যবস্থাপনা" (إدارة التوحش) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে লেখক আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে এই পরামর্শ দেন যে, মুসলিম বিশ্ব হতে আমেরিকা ও ইহুদীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা উৎখাত করার জন্য মুজাহিদদেরকে ইরাক ও আফগানিস্তানে জিহাদ সীমাবদ্ধ না রেখে তা আরো প্রসারিত করে আমেরিকা ও তার ঐক্যজোটের জন্য আরো বেশি ব্যঘাত সৃষ্টি করার প্রয়োজন। লেখক মুসলিম বিশ্বের এমন ছয়টি দেশের কথা উল্লেখ্য করেন যে, সেখানে যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত করে জিহাদকে আরো প্রসারিত করা যেতে পারে এবং আমেরিকার সামরিক শক্তিকে আরো বেশি বিপর্যস্ত করে তার অর্থনৈতিক ক্ষতি কয়েকগুণ বাড়িয়ে তাকে নাজেহাল করা যেতে পারে। শায়খ আবু বকর নাজী এর উপস্থাপিত ছয়টি দেশের মধ্যে পাকিস্তান, জর্ডান, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, ইয়েমেন ও সৌদি আরব এর নাম উল্লেখযোগ্য ছিল। এটাও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, যখন এই প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন আল-কায়েদার কাছে কাজ করার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো লোকবল সেই দেশগুলোতে ছিল না। লেখক তাতে যে মন্তব্য করেছিলেন তা হলো এই যে, মুজাহিদেরা যদি একই সময় মুসলিম বিশ্বে আমেরিকা ও তার স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে একাধিক রণক্ষেত্র বিকাশে সফল হয়, তাহলে আমেরিকার পক্ষে ঐ সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রগুলোকে অবহেলা করা সম্ভব হবে না। যার ফলে তার শক্তিপ্রয়োগ নানা অংশে বিভক্ত হয়ে বিশৃঙ্খলায় পরিণত হবে। লেখক তার মন্তব্যে আরো উল্লেখ করেন যে, আমেরিকাকে ঐ সকল রণক্ষেত্রে জড়িত করার জন্য এটাও আবশ্যক যে, সকল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত মুজাহিদদেরকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে সাথে আমেরিকার স্বার্থের প্রতিও আঘাত হানার অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। এভাবে মুজাহিদরা স্থানীয় জিহাদের ময়দানে নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সাথে ইহুদী-ক্রুসেড ঐক্যের বিরুদ্ধেও আন্তর্জাতিক জিহাদের অংশ হিসেবে কাজ করতে থাকবে। একবার যদি কোনো স্থানীয় জিহাদের ময়দান আন্তর্জাতিক জিহাদের অন্তর্গত হিসেবে পরিচয় লাভ করে এবং আমেরিকার জন্য তা বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আমেরিকার জন্য ঐ সকল ময়দানের দিকে ধাবিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। ফলে, আমেরিকার সামরিক শক্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার অর্থনৈতিক অবনতি ঘটতে বাধ্য হবে; যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অচল হয়ে পড়বে। অতঃপর আমেরিকার মতো অতিকায় হস্তির পক্ষে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যয়বহুল অর্থ যোগানোর সাথে সাথে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের অর্থ যোগানো

সম্ভব হবে না; মোটকথা তার পক্ষে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যয় বহন অসম্ভব হয়ে পড়বে। যদি কিছু কাল এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও আমেরিকার পতনের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে একদিকে আমেরিকার অর্থনীতি অচলাবস্থা হয়ে পড়বে, অপরদিকে মুসলিম বিশ্বের ওপর হতে তার কর্তৃত্ব দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়বে এবং মুজাহিদদের হাতে নিজ নিজ এলাকাতে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার মহা সুযোগ আসবে। শুধু তাই নয় লেখক আরো বলেন যে, মুসলিম বিশ্ব হতে আমেরিকার কর্তৃত্ব শিথিল হওয়ার আগেই যদি এমন কোনো এলাকাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পতন শুরু হয় যেখানে মুজাহিদরা আগে থেকে জিহাদি ময়দান উত্তপ্ত করে রাখেনি, সেই এলাকাগুলোতেও হস্তক্ষেপের জন্য (অর্থাৎ সেই এলাকাগুলোতেও জিহাদি ময়দান উত্তপ্ত করার জন্য) আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৪) নিউ ওয়াল্ড অর্ডার (NEW WORLD ORDER) এর বিপর্যয়ের সূচনা

এটা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ যে, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে মুজাহিদদের নেতারা যে সমস্ত কর্মসূচী ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন, তার সবগুলোই আবু বকর নাজীর উপস্থাপিত পরামর্শ ভিত্তিক যা তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন। **আলহামদুলিল্লাহ!** এই সকল কর্মপন্থার ফলাফলও তাই হয়েছে যা ভবিষ্যৎ বাণীতে করা হয়েছিল। গত ছয় বছর যাবত মুজাহিদরা উপরোক্ত দেশগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোতেই জিহাদের কাজ শুরু করেন এবং পাকিস্তান, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া এবং সোমালিয়া সবগুলোতে জিহাদি আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময় একাধিক জিহাদি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রত্যাশা অনুযায়ী তার ফলাফলও আল্লাহর মেহেরবানীতে ভালই হয়েছে। আমেরিকা ও তার ঐক্যজোট ইহুদী ও ক্রুসেডারদের অর্থনীতি ঐতিহাসিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। **"ডলার"** এর জানাযা বের করা হয়, **"ইউরো"** মার্কেটে টগবগ করছিল এবং পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারা দু'টোই পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম অবস্থার কারণে আমেরিকা ও ইউরোপ তাদের হাজার হাজার সৈন্যদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার পর এবং নিজেদের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করানোর পর ইরাক হতে পরাজয় বরণ করে নিঃসম্বল হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদরা শক্তিশালী হয়ে উঠছে ও তাদের শক্তি অহরহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শত্রুদেরকে কথোপকথন ও সংলাপের জন্য তাদের নিকট আবেদন জানাতে দেখা যাচ্ছে। তারা এটাও ঘোষণা দিয়েছে যে, ২০১৪ সালের শেষের দিকে তারা হানাদার বাহিনীকে আফগানিস্তান হতে সরিয়ে নিবে।

এমনিভাবে, সোমালিয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদেরকে অত্যন্ত প্রশস্ত ও প্রসারিত ভূমির ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। তারা সেখানে সফলতার সাথে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের দ্বীনি আন্দোলন সমূহের জন্য একটি উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করেছে।

পাকিস্তানের কাবায়েলী এলাকা আন্তর্জাতিক জিহাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে এবং পাকিস্তানে এমন জিহাদি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে যা ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের দালালদের জন্য

গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের লক্ষ্য হলো সিন্দ থেকে শুরু করে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে আবারও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। আলজেরিয়ার মুজাহিদরাও ফ্রান্স এবং তার স্থানীয় গোমস্তাদের কাঁধে আরোহণ করে বসেছে এবং নিজ লক্ষ্যে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে।

১৫) সাম্প্রতিক আরব বিশ্বের উত্থান ও পতন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ এরই কৃতিত্ব

শায়খ আবু বকর নাজী এর প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম উম্মাহর মাঝে একাধিক জিহাদি ময়দান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে পরিস্থিতি আমেরিকা ও ইসরাইলের নাগাল ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে হয়ে গেছে এবং ঐ সমস্ত দেশে রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতার পতন শুরু হয় যেখানে আগে জিহাদের ময়দান প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সর্বপ্রথম তিউনিশিয়া যেখানে তিনদশক ধরে জনগনের ওপর চেপে বসা শাসক যয়নুল আবেদীন বিন আলী দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর মিসরের ত্বাগুত হোসনী মুবারককে পুত্রসহ জেলে আটক করা হয়েছে। তারপর লিবিয়ার রাস্তা-ঘাটে অভিশপ্ত গাদ্দাফী ও তার পুত্রকে অপমান ও অপদস্ত করে অবশেষে হত্যা করা হয়েছে। এসবের পর ইয়েমেন এর প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ সালেহ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। সিরিয়াতে "কাফির নুসাইরি ফিরকার" সহায়ক বাশারুল আসাদ এর বিরুদ্ধে সুন্নি মুসলিম জনতা উঠে দাঁড়িয়েছে। এসব দেশের সরকার বিরোধী আন্দোলন শুধু বিক্ষোভ মিছিলে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং অনেক দেশে জিহাদি আন্দোলনও গড়ে উঠেছে। লিবিয়ার রাজধানী "ত্রিপলী" এর বিজয় মুজাহিদদের হাতেই হয়েছে এবং লিবিয়ার সৈন্যদের পরিত্যক্ত অধিকাংশ অস্ত্র "আল-জামা'আতুল মুকাতিলা" এর সাথী মুজাহিদীনদের হাতে আসে।

ইয়েমেনে আল-কায়দার সাথী মুজাহিদরা স্থানীয় গোত্রের সাহায্যে দক্ষিণাঞ্চলের দু'টি প্রদেশ দখল করে নিয়ে "আনসারুশ শরীয়াহ" এর পতাকাতলে ইয়েমেনের ধর্মপ্রিয় মুসলিমদেরকে সংগঠিত করছে এবং সেখানে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

সুসংবাদবহ সর্বশেষ দেশটি হলো আলজেরিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ "মালি", সেখানে মুজাহিদরা বিপ্লব সাধন করেন। যার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই "আনসারুদ দ্বীন" নামক জিহাদি সংগঠন "মালি" এর উত্তরাঞ্চল দখল করে সেখানে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা করেছে।

মোটকথা, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং করুণার পর এটা জিহাদের বিভিন্ন ময়দানে আল্লাহর পথে নিয়োজিত মুজাহিদদের দীর্ঘদিনের ত্যাগ ও তিতিক্ষারই প্রতিফল[2] যে, আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্ব দাজ্জালী

[2]এখানে শুধু মুজাহিদীদের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে উম্মাহর অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকা নেই। আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় নিঃসন্দেহে উলামায়ে কিরাম, দ্বীনের দিকে আহ্বানকারী দায়ী এবং সাধারণ মুসলিমদের সবারই ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু, এখানে বিশেষভাবে মুজাহিদদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো এই যে, এরা উম্মাহর প্রথম স্তরের সৈনিক যারা পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে উপেক্ষা করে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে উম্মাহর

জীবন ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে এবং মুসলিম উম্মাহকে আমেরিকার দালাল স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে জেগে উঠার এবং তাদেরকে উৎখ্যাত করার সুযোগ হয়েছে।

উপরোক্ত এসব ঘটনাবলী হতেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এই যে, আল্লাহর মুজাহিদ বান্দারা ইসরাইলের অপবিত্র অস্তিত্বকে চতুর্দিক দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে। একদিকে মিসরের সিনা উপত্যকায় উপস্থিত মুজাহিদরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিরতিহীন অভিযানের মাধ্যমে ইসরাইলের সাধারণ জীবনযাত্রা দুরূহ করে তুলেছে। অপরদিকে সিরিয়ার দিক থেকেও মুজাহিদরা ইসরাইলের সীমান্তে এসে বসেছে। ইনশাআল্লাহ সেই দিন বেশি দুরে নয়, যখন ইসলামের সৈনিকদের হাত ইহুদীদের ঘাড়ের উপর হবে!

১৬) মুজাহিদীনরা আজও নিজ লক্ষ্যে অবিচল আছে

আলহামদুলিল্লাহ! আল-কায়দা তার প্রতিষ্ঠার প্রায় পঁচিশ বছর অতিবাহিত করার পরও মুসলমানদের মুক্তি এবং (خلافت على منهاج النبوة) অর্থাৎ নবুয়্যতি মানহাযে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজকে পুনর্জীবিত করার দায়িত্বে অটল রয়েছে। যে ঝাণ্ডা আশির দশকের শেষের দিকে শায়খ আব্দুল্লাহ আয্যাম শহীদ (রহঃ) হতে শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল, তা গতবছর শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ) এর নিকট হস্তান্তর হয়েছে। মুজাহিদীনদের এই মুবারক জিহাদি কাফেলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আজও অকাট্য ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে যা তার প্রতিষ্ঠালগ্নে ছিল। শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ) আমির নির্বাচিত হওয়ার কালে আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তারা নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নতুন করে পুনরাবৃত্তি করেন। তার বিশেষ অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে বিশ্বমানবতাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি এবং মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের প্রস্তুতি ও কিতালের ময়দানে অবতরণ করার জন্য উদ্দীপ্ত করছি। এর সাথে সাথে আমরা নিজেরাও নিজেদের শক্তি সামর্থ্য জিহাদের পথে ব্যয় করে প্রতক্ষ্যভাবে জিহাদের ফরজ দায়িত্বপালন করছি এবং আমাদের লড়াই মুসলিম দেশের ওপর হস্তক্ষেপকারী দখলদার কুফফারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত রয়েছে যাদের প্রধান হচ্ছে আমেরিকা ও তার পালক পুত্র ইসরাইল। আমরা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি ঐ সমস্ত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যারা দখলদার কুফফারদের সাহায্য করেছে এবং আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজেদের আইন প্রবর্তন করে ইসলামী শরিয়তকে পদদলিত করেছে। এমনিভাবে আমরা উম্মাহকে নিজ জান-মাল এবং সর্বস্ব নিয়ে ঐ সমস্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছি যারা মুসলিমদের ভূমি দখল করে বসে রয়েছে। আমরা এ জিহাদকে ঐ সময় পর্যন্ত

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ শত্রুদেরকে দমন করে আসছে এবং স্বীয় রক্ত দিয়ে মুসলিম উম্মাহর হিফাযতের জন্য তাদের চতুর্দিকে শক্ত প্রাচীর গড়ে তুলেছে। অতএব, উম্মাহর এই অগ্রগামী সৈনিকদের প্রাপ্য এটাই যে, আমরা মনেপ্রাণে তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দান করি।

অব্যাহত রাখার জন্য আহ্বান করছি যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম দেশ হতে দখলদাররা প্রত্যাবর্তন না করে এবং সেখানে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত না হয়।

- আমরা ফিলিস্তিনের জিহাদ হতে বিন্দুপরিমাণ অন্যমনস্ক হবো না আর না স্বেচ্ছাচার ইসরাইলী রাষ্ট্রকে কোনোরকম বৈধ বলে স্বীকার করবো এমনকি যদিও সমস্ত বিশ্ব এতে একমত হয়। আমরা নিজেদের সবকিছু ঐ সময় পর্যন্ত ব্যয় করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত ফিলিস্তিন ইসরাইলের কবল হতে মুক্তি লাভ না করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে ইসলামের পতাকা উত্তোলিত না হয়।
- আমরা আফগানি ভাইদের সাথে পুনরায় অঙ্গিকার করছি যে, আমরা তাদের সাথে আছি এবং আমরা আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ এর নেতৃত্বে নিজ জান ও মাল নিয়ে উপস্থিত থাকবো ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকার ক্রুসেড সৈন্যবাহিনীকে আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমির এক এক অংশ থেকে উৎখাত না করতে পারবো।
- সমগ্র বিশ্বের ইসলামী সংগঠন ও জামা'আতের সাথে জড়িত মুসলিম এবং অন্যান্য ঐ সমস্ত সাধারণ মুসলিমদের সাহায্যার্থে আমাদের হস্ত প্রসারিত থাকবে। আমাদের হৃদয় তাদের জন্যও প্রসারিত রয়েছে যারা ইসলামের সাহায্যার্থে কাজ সম্পাদন করছে। আমাদের সকলের জন্য বাঞ্ছনীয় যে, আমরা মুসলিম ভূখন্ডের ওপর আক্রমণকারী শত্রুদেরকে প্রতিহত করি, সেখানে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা তথা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সক্রিয়ভাবে একে অপরের হস্ত ধারণ করি এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বাতিল শাসনব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে নিজেদের ভূমিসমূহকে সকল প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন এবং দুর্নীতি থেকে মুক্ত করার জন্য একে অপরের সহায়ক হই।

এ পথ দুরূহ সমস্যায় জর্জরিত এবং এ পথে অনেক জিহাদি নেতাদের শাহাদাত বরণ সত্যেও এই ঐতিহাসিক জিহাদি কাফেলা নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আজও অটল রয়েছে। আল-কায়েদা এত কষ্টকর পরিস্থিতির পরও নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে কোনো ধরনের অবনতি আজ পর্যন্ত ঘটতে দেয়নি আর না ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ কোনো ধরনের অবনতি ঘটতে দিবে।

১৭) নবী করিম (ﷺ) এর ভবিষ্যৎ বাণীর দৃশ্য সজ্জিত হতে দেখা যাচ্ছে

আজ উম্মত সমষ্টিগতভাবে জেগে উঠেছে। কুফফারদের প্রতিষ্ঠিত বাতিল জীবনব্যবস্থায় ফাটল স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। উম্মাহ এক মিল্লাত হিসেবে নতুন দিগন্তে প্রবেশ করছে। নবী করিম (ﷺ) এর ভবিষ্যতবাণীর দৃশ্য বিশ্বজুড়ে সজ্জিত হতে দেখা যাচ্ছে। হাদিস শরিফে উল্লেখ্য উম্মাহর বিজয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ খোরাসান, ইয়েমেন এবং সিরিয়াতে জিহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার ঝড় উঠেছে।

জিহাদ এখন আর আল-কায়েদা অথবা তালেবান মুজাহিদ অথবা অন্য কোনো সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মুসলিম উম্মাহ একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আজ কুফফারদের সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছে।

কবি ইকবাল (রহঃ) বলেনঃ

نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا

سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گا

মরুপ্রান্তর হতে আসা যে সিংহ

ঘটিয়েছিল রোমীয় সাম্রাজ্যের পতন

শুনেছি আমি মহান প্রভূর কাছে

সেই সিংহ আবার উঠবে ঘুম থেকে

বর্তমান এই অবস্থা থেকে এই জিহাদকে তার লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এই উম্মতের সকল স্তরের প্রত্যেক নর-নারী এবং যুবক ও বৃদ্ধা অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর আবালবৃদ্ধবনিতাসহ সকল স্তরের মুসলিমদের কাছে দাবী করছে যে, আপনারা এই বাস্তবতাকে অনুধাবন করুন। উম্মতকে পৃথিবীর বুকে তার সম্মান বজায় রাখার জন্য দ্বীন ও শরীয়াতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে, বিশেষ করে জিহাদকে তার সঠিক মূল্যায়ন দিতে হবে আর এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে দুনিয়ার বুকে মুসলিম উম্মাহর স্থায়িত্ব।

নবী করিম (ﷺ) আমাদের উত্থান ও পতনের কারণ দু'টিই অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু অর্থবোধক বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃ

« إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ».(سنن ابى داوٗد)

"যখন তোমরা সুদি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকবে, গরু-বাছুরের লেজ ধরে ব্যতিব্যস্ত হবে, চাষাবাদে সন্তুষ্ট হবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর এমন অবমাননা চাপিয়ে দিবেন যা তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করবে।" [সুনানে আবু দাউদ]

এ উম্মাহ তখনই সম্মানের অধিকারী হবে যখন সে সত্যিকার অর্থে দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং দ্বীনের রক্ষক হিসেবে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

১৮) ইসলামের সৈনিক তথা মুজাহিদদের দায়িত্ব

আজ সারা বিশ্বের মুজাহিদদের বিশ্বের ভয়াবহ পরিস্থিতি ও তার গুরুত্বকে বুঝতে হবে এবং তার সাথে সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে হবে।

আজ মুজাহিদদের জন্য কতিপয় দায়িত্ব অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা নিচে দেওয়া হলঃ

(১) মুজাহিদদেরকে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিজ অন্তরের অন্তঃস্থলে পাকাপোক্ত করতে হবে যে জিহাদই হলো এখন তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং জীবন পদ্ধতি। আগত পর্যায়ে পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেনো সে পর্যায়ে যদি জিহাদের পথে চলাও কঠিন হয়ে যায় তবুও কোনো ক্রমেই জিহাদ হতে পশ্চাৎপদ হওয়া যাবেনা। জিহাদ হতে পিছপা হয়ে এবং দুনিয়ার লোভ-লালসায় পড়াকে এমন কষ্টকর ও বিষাদ মনে করবে যেমন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করাকে মনে করা হয়।

(২) মুজাহিদদেরকে নিজের আরোপিত দায়িত্বের অনুভূতি নিয়ে পরস্পরে মতানৈক্যের এক এক কণিকাকে প্রত্যাখান করে মজবুত প্রাচীরের ন্যায় একচ্ছত্রভাবে দ্বীনের শত্রুদের ওপর আক্রমন করতে হবে এবং সর্বাস্থায় নিজেদের ঐক্যকে হিফাযত করতে হবে।

(৩) মুজাহিদদেরকে স্থানীয় জিহাদের ময়দানকে আন্তর্জাতিক জিহাদের সাথে সংযুক্ত করার সত্যিকার প্রচেষ্টা করতে হবে; স্থানীয় দ্বীনত্যাগী মুরতাদদের ওপর হাতুড়ী মারার সাথে সাথে আমেরিকা এবং তার ইহুদী-ক্রুসেড জোটের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে কোনো ধরনের দ্বিধাবোধ করা যাবে না। যে জিহাদের ময়দান যত বেশী বিশ্ব কুফরের জন্য বিপজ্জনক হবে, সেই ময়দান ততবেশি দ্বীনের উপকার এবং ইসলামের মর্যদা সমুন্নত করবে ইনশাআল্লাহ।

(৪) মুজাহিদদের নেতৃবৃন্দদের জন্য বাঞ্চনীয় যে, তারা মুসলিম উম্মাহকে প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে সম্বোধন করে এবং হিকমতের সাথে তাদেরকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করার কাজকে বলবৎ রাখে যেনো আমাদের প্রিয় উম্মাহ আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং তারা মুজাহিদদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

(৫) মুজাহিদদের জন্য এটাও জরুরী যে, তারা প্রতিপালকের সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করে, সাধারণ মুসলিমদের সাথে নম্র ব্যবহার করার চেষ্টা করে ও তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে, সর্বদা নিজের নিঃসম্বলতাকে স্মরণ রাখে এবং রাব্বুল আলামীন এর কাছে ভিখারীর সেজে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে ও গুনাগারের বেশে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে - আমাদের প্রত্যেকে এই পৃথিবী হতে যেন এমন অবস্থায় বিদায় নিতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাদেরকে জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত দান করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই উম্মাতকে (خلافت على منهاج النبوة) অর্থাৎ নবী (ﷺ) এর পদ্ধতি অনুসারে খিলাফতের স্বর্ণযুগ দেখার পুনরায় সুবর্ণ সুযোগ দান করুণ এবং কুফরী ব্যবস্থা ও তাদের প্রবক্তাদেরকে লাঞ্চিত করুন। আমিন!

আর আমাদের সর্বশেষ বাণীঃ সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর সাহাবীগণ এবং তাঁর অনুসারীদের উপর।